বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র
বাজেট ভাবনা: অর্থবছর ২০২১-২২

তারিখ: ২৮ মে, ২০২১।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ, আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের ৫০ বছর পূর্ণ করেছে এ বছর। ১৯৭১ সালে একটি সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা করে নেয় আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। বর্তমানে একদিকে ফ্যাসিস্ট সরকারের যাঁতাকলের মধ্যে করোনা মহামারীতে বিপর্যস্ত মানুষের স্বাভাবিক জীবন ও অন্যদিকে দেশের স্বাধীনতার ৫০তম বার্ষিকী উদযাপন করছি আমরা! এরকম এক ঐতিহাসিক মহাযুগসন্ধিক্ষণে এবারের ৫০তম জাতীয় বাজেট প্রণীত হতে যাচ্ছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর (১৯৭১-৭৫) যারা সরকারে ছিলেন ঐ সময় দেশের অর্থনীতিকে 'Basket Case'/ 'Bottomless Basket' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার শহীদ রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমানের হাত ধরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রাথমিক সোপানে উঠে বাংলাদেশ। আজকের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডের ভিত্তি গার্মেন্টস শিল্প ও প্রবাসী আয় শহীদ জিয়ারই অবদান। এরপর ১৯৯১ সালে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠনের পর থেকে অর্থনীতিতে নতুন গতিপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। মুক্তবাজার অর্থনীতি, ভ্যাট প্রবর্তনসহ তিনি যে নানামুখী সংস্কারমূলক কাজ করেছেন, আজকের অর্থনীতি তো তার উপরই দাঁড়িয়ে আছে। তৎকালীন বিরোধীদল আওয়ামী লীগ কর্তৃক সৃষ্ট নজিরবিহীন বৈরী পরিবেশ সত্ত্বেও বিএনপি সরকারের সময় ২০০৬-০৭ অর্থবছরে সর্বশেষ ৭.০৬% প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। MGD লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকেও তখন বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। আমরা গর্বিত যে আজকের বাংলাদেশ শহীদ জিয়ার বপনকৃত উন্নয়নের সেই ধারাবাহিকতা, ও দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বের সফলতার ফসল। যদিও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে এসে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বিরাট ব্যবধান রয়েছে; রয়েছে চরম গণতন্ত্রহীনতা, আইনের শাসন ও সুশাসনের অভাব এবং মতপ্রকাশের অধিকার এবং মৌলিক অধিকারসহ উলঙ্গ মানবাধিকার লঙ্ঘন। সে সব নিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত প্রতিবাদ করছি। কিন্তু ৫০ বছর পূর্তির প্রাক্কালে বাজেট-ভাবনা উপস্থাপনার সময় নতুন প্রজন্মকে এদেশের উন্নয়নের মূল রূপকার শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও বেগম খালেদা জিয়া এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আমি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গকারী সকল শহীদদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। আমি বর্তমানে অন্যায়ভাবে কারাবন্দী চিকিৎসাধীন বেগম খালেদা জিয়ার অবদানের কথা স্মরণ করছি এবং তাঁর আশু রোগমুক্তি কামনা করছি এবং অবিলম্বে তাঁর নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করছি।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারীর প্রকোপে সারা বিশ্ব আজ বিপর্যস্ত। জাতি আজ এক মহাদুর্যোগকাল অতিক্রম করছে। কতদিন এ দুর্যোগ চলবে তাও অনিশ্চিত। জীবন ও জীবিকার টানাটানিতে জনজীবন ও অর্থনীতি দুটোই মহাসংকটে রয়েছে। করোনা সংক্রমণ রোধ করতে না পারলে কোনোভাবেই অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়। করোনা সংকট মোকাবেলায় এবং করোনাকালে অর্থনীতিকে সচল রাখতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে সরকার চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতা এবং এর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিণতির দায় বর্তমান ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকারকেই বহন করতে হবে।

উপস্থিত সাংবাদিকবৃন্দ,

শীর্ষ অর্থনীতিবিদরা বলছেন করোনাকালের এবারের বাজেট গতানুগতিক বাজেট হওয়া উচিৎ নয়। করতে হবে বিশেষ সময়ের বিশেষ বাজেট। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হবে করোনার প্রভাব মোকাবিলার মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা

নিশ্চিত করা ও দুর্ভোগ উপশম করা। ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করে স্বাভাবিক গতি ফিরিয়ে আনা। এজন্য দরকার হবে সহায়ক নীতি সহায়তা। অনেকে মনে করেন, করোনার ভয়াবহতা না কমলে গতানুগতিক বাজেট করে কোনো লাভ নেই। লক্ষ্য হওয়া উচিত আগামী ৬ মাসের জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট করা। কারণ করোনার কারণে পূর্ণাঙ্গ বাজেটের কোনো লক্ষ্যই অর্জিত হবে না। আবার অনেকে মনে করেন, অর্থনীতির অস্বাভাবিক সংকোচনে প্রচলিত বাজেট ব্যবস্থা থেকে সরে এসে ৩ বছরের মধ্য-মেয়াদি পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার আলোকে বাজেট প্রণয়ন করতে হবে। বিদায়ী অর্থবছরে বিএনপি'র পক্ষ থেকে আমরাও এ দাবি জানিয়েছিলাম। কিন্তু প্রথাগত গতানুগতিক বাজেট কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে একটি "বিশেষ করোনা বাজেট" না দিয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য দেয়া হ'ল ৫ লক্ষ ৬৮ হাজার কোটি টাকার একটি গতানুগতিক অবাস্তবায়নযোগ্য বাজেট যা জাতিকে হতাশ করেছে। শেষ পর্যন্ত এই বাজেটের কোনো লক্ষ্যই সেভাবে পূরণ হয়নি। না রাজস্ব আহরণে, না প্রক্ষেপণকৃত উন্নয়ন, প্রণোদনা ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী বাস্তবায়নে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে ADP বাস্তবায়ন হয় মাত্র ৪৯.১৩%। আর চলতি অর্থবছরে প্রথম ১০ মাসে মাত্র ৪৯.০৯% ADP বাস্তবায়ন হয়েছে (সূত্রঃ বাস্তবায়ন, পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ- আইএমইডি'র প্রতিবেদন)। দুইমাসে খরচ করতে হবে ১ লাখ ৬ হাজার ৫৪২ কোটি টাকা!! এমনিতেই বরাদ্দ কম, তার ওপর বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করতে পারে না মন্ত্রণালয়। তাহলে এ বাজেটের অর্থ কি?

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারীর প্রভাবে এক পরিবর্তিত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, এবং সামাজিক যুগসন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে পৃথিবী। বিশ্বের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাধর দেশগুলোও নিজেদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল সংস্কারে নজর দিচ্ছে। এটি দেখা যাচ্ছে মহামারীকালীন বিশ্বব্যবস্থায় বাজেট প্রণয়নসহ বড় বড় অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণে তাদের নতুনত্ব ও অভিনবত্ব থেকে। এখন উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া (Tickle down economics) অর্থনৈতিক উন্নয়নের ঐতিহাসিক ধারার বদলে তারা বিকেন্দ্রীকৃত তৃণমূল ও মধ্যম শ্রেণির উন্নয়নের (Bottom up, Middle out) উপর জোর দিচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান অনির্বাচিত সরকার এবারও আগামী অর্থবছর ২০২১-২২ এর জন্য ৬ লক্ষ ২ হাজার ৮৮০ কোটি টাকার একটি বিশাল, অবাস্তবায়নযোগ্য, উচ্চাভিলাষী গতানুগতিক বাজেট পেশ করতে যাচ্ছেন বলে সংবাদমাধ্যমে জানা গেছে। বিগত বছরের অভিজ্ঞতা কিংবা পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিকে আমলেই নেয়নি সরকার। আপনারা জানেন, চলতি অর্থবছরের বাজেট ৫ লক্ষ ৬৮ হাজার কোটি টাকা। আসন্ন বাজেটটির আকার হবে আরো ৩৫ হাজার কোটি টাকার মতো বেশি এবং সংশোধিত বাজেটের চেয়ে ৬৪ হাজার কোটি টাকা বেশি। আসন্ন অর্থবছরে এনবিআরের রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩ লাখ ৮৯ হাজার ৭৮ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ৩ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু প্রথম ৮ মাসে আদায় হয়েছে মাত্র ১ লাখ ৫১ হাজার ৪৭২ কোটি টাকা, যা ৫০% এরও নীচে। বাকি ৪ মাসে আদায় করতে হবে ১ লাখ ৭৮ হাজার ৫২৮ কোটি টাকা। বর্তমানে করোনাভাইরাসে বিপর্যস্ত অর্থনীতি। উৎপাদনের চাকা ঘুরছে না গত বছরের মার্চ থেকে। রপ্তানি আয় কমেছে। আমদানি হ্রাস পেয়েছে। বিনিয়োগ প্রায় শূন্য। মানুষের হাতে টাকা নেই। নিম্ন আয়ের মানুষ জীবন জীবিকা নিয়ে হুমকির সম্মুখীন। বিদেশে শ্রম-বাজারও দিন দিন সংকুচিত হয়ে আসছে। এ পটভূমিকায় খোদ অর্থনীতিবিদরাই শংকা প্রকাশ করেছেন যে নির্ধারিত রাজস্ব আদায়ে NBR ব্যর্থ হবে। জেনে শুনে এ ধরনের অবাস্তব টার্গেট তাই তামাশা ছাড়া আর কি হতে পারে! বাজেট ঘাটতি অনুমান করা হয়েছে ২ লাখ ১৩ হাজার ৮০২ কোটি টাকা যা জিডিপি'র ৬.৫% । এত বিশাল পরিমাণ বাজেট ঘাটতি এই প্রথম। বাজেটে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অনুমাণ করা হয়েছে ৭.২%, পরে কমিয়ে করা হয়েছে ৬.১% । যা আগের অনুমিত ৮.২% প্রবৃদ্ধির চেয়ে ১% কম। তবে এ সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৪ বা ৪ শতাংশের আশেপাশে হতে পারে। এদিকে সরকার অদ্যাবধি ২০১৯-২০ এর চূড়ান্ত প্রবৃদ্ধি নির্ধারণ করতেই ব্যর্থ হয়েছে। যা হোক, জীবন-জীবিকার টানাটানির এ দুর্যোগকালে প্রবৃদ্ধি কোনো ইস্যু নয়। এখন প্রবৃদ্ধির কথা না বলে বরং কর্মসংস্থান এবং মানুষের জীবন ও জীবিকা রক্ষার কথাই বলতে হবে। কারণ জীবন ও জীবিকার সমন্বয়ের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে, তবে

মনে রাখতে হবে জীবিকার চেয়ে জীবন আগে। তাই এবারের বাজেট হতে হবে মূলত জীবন বাঁচানোর বাজেট। এ বাজেট হওয়া উচিৎ ঝুঁকি মোকাবেলা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বাজেট। এ বাজেট হতে হবে জনস্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষার বাজেট।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

পরিকল্পনা মন্ত্রী দাবি করেছেন এ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় নাকি ২৪৩ ডলার বেড়ে বর্তমানে ২২২৭ মার্কিন ডলার-এ দাঁড়িয়েছে। মানুষের অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যয়ের যে চিত্র চারিদিকে তাতে তো তা প্রতিভাত হয় না। ক্রনি ক্যাপিটালিজমের এ যুগে সরকারের মদদপুষ্ট কিছু ব্যক্তির ভাগ্য আরও প্রসন্ন হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নাই। আম-জনতার আয় বরং আরও কমেছে। বিশ্বব্যাংকের এক গবেষণায় দেখা গেছে মানুষের আয় কমেছে ৩৭ শতাংশ। বেতননির্ভর মানুষের আয় কমেছে ৪৯ শতাংশ। দেশে গত কোভিড সময়ে ২ কোটি ৪৫ লক্ষ নতুন দরিদ্রের সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে মাথাপিছু আয় বাড়লটা কার? একটি জাতীয় দৈনিকে 'মধ্যবিত্তের গোপনে হাত পাতা যখন ইউএনও'র কাছে দুষ্টামি' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে মধ্যবিত্তের বর্তমান যে হাল-চাল ফুটে উঠেছে- তাতে রীতিমত শিউরে উঠেছি। নারায়নগঞ্জের এই হতভাগ্য ফরিদ আহমেদ বর্তমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিভূ হয়ে আছে। করোনার এই কঠিন সময়ে সবচেয়ে বিপাকে আছে মধ্যবিত্তরা। আয় কমে গেছে, অনেকের চাকুরি নেই, চাকুরি থাকলেও বেতন নেই। মধ্যবিত্তরা হাত পাততে পারেন না বা টিসিবি ট্রাকের লাইনেও দাঁড়াতে পারেন না। হোসিয়ারি কারখানায় অল্প বেতনে কাজ করা এই ফরিদগণ সরকারেরই দেয়া ৩৩৩ নম্বরে ফোন করে গোপনে খাদ্য সহায়তা চেয়েছিলেন। সহায়তা তো দেয়া হয়ইনি, বরং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আর্থিক সহায়তা চাওয়ার মিথ্যা অপরাধের অজুহাত এনে পরিবারটিকে একেবারে পথে বসিয়ে দেয়া হলো। এ হলো বর্তমান জবাবদিহীহীন সরকারের মানবকল্যাণ। আর এ হচ্ছে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির প্রকৃত চিত্র। ২০০০ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করত ৪৮ দশমিক ৯ শতাংশ মানুষ। ২০০৫ সালে তা নেমে এসেছিল ৪০ শতাংশে। এরপর ক্রমে দারিদ্র্যের হার কমেছে। যেমন কোভিডের আগে সরকারি হিসাবে দারিদ্র্যের হার ছিল ২০ দশমিক ৫ শতাংশ। কিন্তু মহামারীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গেছে। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সানেম জরিপ করে বলছে, ৪২ শতাংশ মানুষ এখন দরিদ্র। দেখা যাচ্ছে মধ্যবিত্তদের বড় অংশই নিম্নবিত্তের কাতারে চলে গেছেন।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আসছে বাজেটেও কালো টাকা সাদা করার সুযোগ রাখা হচ্ছে। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, 'যতদিন অপ্রদর্শিত আয় থাকবে, ততদিন এ সুযোগ থাকবে'। অর্থাৎ হরিলুট করে সঞ্চিত কালো টাকা জায়েজ করার দরজা অবারিত করে দিলেন অর্থমন্ত্রী, যা অনৈতিক এবং ন্যায়নীতি মেনে আইন পালনকারী নাগরিকদের প্রতি অবিচার। কোভিডকালীন সময়ে এত কালো টাকা কারা আয় করেছে জাতি তা জানতে চায়। জাতি জানতে চায় এরা কারা ? যদিও এরই মধ্যে সরকারদলীয় ও সরকারের মদদপুষ্ট অনেক রাঘব বোয়ালের নাম বেরিয়ে পড়েছে।

এদিকে অপ্রদর্শিত আয়ের বিরাট অংশ মানি-লন্ডারিং হয়ে যাচ্ছে। ২৫ মে প্রকাশিত একটি জাতীয় দৈনিকে পড়লাম গত ১০ বছরে সড়কের সর্বনাশ করা শুধু নিম্নমানের ভেজাল বিটুমিন আমদানির আড়ালে পাচার হয়ে গেছে ১৪ হাজার কোটি টাকা। এটি হচ্ছে পাচার-কাহিনীর Tip of the iceberg. ওয়াশিংটনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটির (জিএফআই) এর প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশ থেকে অস্বাভাবিক হারে টাকা পাচার বেড়েছে। বছরে পাচার হয় ১ লক্ষ কোটি টাকার অধিক। সাত বছরে পাচার হয়েছে ৫,২৭০ কোটি ডলার, টাকার অংকে যা সাড়ে ৪ লক্ষ কোটি টাকা। যা ২০১৯-২০ সালের জাতীয় বাজেটের প্রায় সমান। টিআইবি'র মতে পাচারের এ তথ্য আংশিক। প্রকৃত চিত্র আরো ভয়াবহ। এই পরিমাণ অর্থ দিয় ৪টি পদ্মা সেতু নির্মাণ করা সম্ভব হতো। বিদেশ থেকে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে মূল্য বেশি দেখানো (Over invoicing) এবং রফতানিতে মূল্য

কম দেখানো (Under invoicing)'র মাধ্যমেই মূলত এ অর্থ পাচার হয়ে থাকে। তাছাড়া হুন্ডিসহ অন্যান্য গোপন পথে মানি-লন্ডারিং তো আছেই।

সরকার দাবি করছে যে কোভিড থেকে উত্তরণে প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। অথচ এটি প্রণোদনা নয়, এটা ছিল ব্যাংকনির্ভর Loan. অথচ সরকার এই Loan ও টার্গেট গ্রুপের কাছে পৌঁছাতে পারেনি। একটি জাতীয় দৈনিকের প্রতিবেদন অনুযায়ী ৬৯% ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কোনো প্রণোদনাই পায়নি, ৯% প্রণোদনা সম্পর্কে জানেই না, ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান পেয়েছে ১০%, মাঝারি ২৮% এবং বড় প্রতিষ্ঠান ৪৬%। প্রণোদনা প্রাপ্তিতে একেবারেই পিছিয়ে আছে পাইকারি বিক্রেতা, রেঁস্তোরা, পরিবহণ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাত। বড় শিল্পপতিরা প্রণোদনা তহবিল যতটা পেয়েছে, তার চেয়ে কম পেয়েছে মাঝারি শিল্প, এবং তার চেয়েও কম পেয়েছে ছোট উদ্যোক্তারা। কুটির শিল্প পেয়েছে আরও কম। অথচ উচিত ছিল সবচেয়ে ছোট যারা, তাদের ক্ষেত্রেই তহবিলের সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন। কারণ, তাদের প্রয়োজনটাই বেশি। ব্যাংকগুলোর কাছে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলো একেবারেই উপেক্ষিত। এ জন্য কুটির শিল্পকে কত ঋণ দিতে হবে, ছোট শিল্পকে এবং মাঝারি ও বড়দের কত দিতে হবে এগুলোর লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট করে বেঁধে দিতে হবে। এসব বিষয় উপর থেকে ঠিকভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে না। সরকার সিন্ডিকেট করে দলীয় ব্যবসায়ীদের প্রণোদনা দিয়েছে, ভিন্নমতাবলম্বীরা মোটেই পায়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। বাজেটে অর্থ বরাদ্দের পূর্বে তা ব্যয়ের একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ জরুরি, সরকার সে বিষয়টি কখনোই গুরুত্ব দেয়নি। যেমন কাজ হারানো শ্রমিকদের জন্য গঠিত তহবিলের টাকাও সরকার খরচ করতে পারেনি। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জার্মান সরকারের অনুদানে দেয়া ১৫০০ কোটি ডলারের এই তহবিল থেকে করোনায় কাজ হারানো শ্রমিককে ৩ মাস ৩ হাজার টাকা করে দেয়ার কথা থাকলেও এ খাতে ৬ মাসে খরচ হয়েছে মাত্র ৫ লক্ষ ৯০ হাজার ডলার (প্রতি ডলার ৮৪.৭৪ টাকা হিসেবে)। তাই বিশাল বাজেট করে কি হবে যদি তার সঠিক বাস্তবায়ন না হয় ?

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,
সরকার ২৩টি প্যাকেজের মাধ্যমে প্রায় সোয়া ১ লাখ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছিল। এই প্যাকেজের মধ্যে দরিদ্র ও কর্মহীন মানুষের সামাজিক সুরক্ষাসংক্রান্ত প্যাকেজ মাত্র সাতটি। এতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১০ হাজার ১৭৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ ৮০ শতাংশই ব্যাংকনির্ভর ঋণ প্যাকেজ। এতে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত, দুস্থ, গরিব, দিনমজুর, শ্রমিকেরা উপকৃত হয়নি। এই সাতটি সুরক্ষা প্যাকেজের অর্থও কাঙ্ক্ষিতদের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। এসব কর্মসূচীর আওতায় এখন পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে মাত্র ৪ হাজার ৪৮১ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রায় ৫৬ শতাংশ এখনো বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। সর্বোপরি, সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের অর্ধেকই পৌঁছেনি ভুক্তভোগীদের হাতে। ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের ৫০ হাজার ৯৫৭ কোটি টাকা বিতরণই সম্ভব হয়নি, যা মোট অর্থের প্রায় ৪২ শতাংশ। প্যাকেজ বাস্তবায়নে সরকারের উদাসীনতা ও আন্তরিকতার অভাবই এ জন্য দায়ী। ব্যাংকনির্ভর না হয়ে প্রণোদনার অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রদানের ব্যবস্থা করলে ক্ষতিগ্রস্তদের অর্থ পেতে অসুবিধা হতো না। বর্তমান বাজেটে ১০টি মেগা প্রকল্পের জন্য ৫০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়। তন্মধ্যে রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পের জন্যই ২০ হাজার কোটি টাকা, অথচ কোভিডের সময় এসব মেগা প্রকল্পে বরাদ্দ কমিয়ে সে অর্থ নিঃস্ব, বেকার, ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে নগদ অর্থ বণ্টনের জন্য বরাদ্দ করা যেতো। এ টাকা দিয়ে হতদরিদ্রদের হাতে আরো নগদ অর্থ প্রদান, জেলা/উপজেলা পর্যায়ে ডেডিকেটেড সংক্রামক ব্যাধি কোভিড হাসপাতাল নির্মাণ, আইসিইউ স্থাপন, অক্সিজেন প্ল্যান্ট স্থাপন, স্কুল থেকে ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়া (dropout) রোধ এবং বৃত্তি প্রদানের মতো নানামুখী কল্যাণমূলক কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হতো।

উপস্থিত সাংবাদিকবৃন্দ,

করোনাকালে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাত যে কতটা দুর্বল ও ভঙ্গুর এবং কতটা অবহেলার শিকার তা প্রমাণিত হয়েছে। এ সময় বিগত ১২ বছর ধরে সংঘটিত দুর্নীতির কদর্য চেহারা উন্মোচিত হয়েছে। করোনাকালে প্রমাণ হয়েছে বর্তমান সরকার স্বাস্থ্য খাত ব্যবস্থাপনায় কতটা ব্যর্থ হয়েছে। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হলে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা খাতের চিত্র আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। চিকিৎসা সামগ্রীর অভাবে রোগী ভর্তি করা যাচ্ছে না, অক্সিজেনের অভাব মানুষ মারা যাচ্ছে। ICU এর অভাব। এ্যাম্বুলেন্সেই অসহায় মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে। স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও স্বাস্থ্য বিভাগের অযোগ্যতা চোখে পড়ার মতো। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিগত ১০ বছরের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবার এডিপি বাস্তবায়ন চলতি বছরই সবচেয়ে কম। গত এক দশকের মধ্যে এবারই সবচেয়ে কম উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ। প্রথম ১০ মাসে এডিপি বাস্তবায়িত হয়েছে মাত্র ৪৯ দশমিক ৯ শতাংশ। মহামারীর এই সময়ে ব্যয়ও বাড়েনি। বরাদ্দের মাত্র ২৫ দশমিক ৪৬ শতাংশ ব্যয় করতে পেরেছে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ। বরাদ্দকৃত ১১ হাজার ৯৭৯ কোটি ৩৪ লাখ টাকার মধ্যে, গত এপ্রিল পর্যন্ত খরচ হয়েছে মাত্র ৩ হাজার ৪৯ কোটি ৪৮ লাখ টাকা। স্বাস্থ্য খাতের মতো এমন গুরুত্বপূর্ণ খাতকে অবহেলিত রেখে বিশাল বাজেট প্রণয়ন করে কি হবে?

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,
আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি'র পক্ষ থেকে আমরা বারবার করোনার প্রথম ঢেউ মোকাবেলায় জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে সমন্বিত পরিকল্পনা এমনকি প্রয়োজনে স্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা জারির বিষয়েও ভেবে দেখার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছিলাম। বিএনপি থেকে বিভিন্ন খাতে ৮৭ হাজার কোটি টাকার সুনির্দিষ্ট প্যাকেজ প্রণোদনার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। সরকার তাতে কর্ণপাত করেনি। সারা বিশ্বে যখন স্বাস্থ্য খাতে ক্রমাগত বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন আমাদের কমছে। এদিকে মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে চিকিৎসাসেবা দ্রুতগতিতে পণ্যে পরিণত হচ্ছে। ব্যক্তির স্বাস্থ্য ব্যয় কমার বদলে বেড়ে ২০১৭ সালে ৬৭ শতাংশে আর ২০১৯ সালে ৭২ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। অপর দিকে, ২০১৭ সালের স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রতিবেদনে দেখা যায়, সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ব্যক্তির পকেট থেকে খরচ মালদ্বীপে ১৮, ভুটানে ২৫, শ্রীলঙ্কায় ৪২, নেপালে ৪৭, পাকিস্তানে ৫৬ আর ভারতে ৬২ শতাংশ। অর্থাৎ বাংলাদেশেই সবচেয়ে বেশি। এর ফলে স্বাস্থ্যের ব্যয় মেটাতে গিয়ে আমাদের দেশে প্রতি বছর প্রায় ৬০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাচ্ছে (প্রথম আলো, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ও ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯)।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,
বিশ্বব্যাংক ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১৫ সালের হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতে বছরে মাথাপিছু ব্যয় হয় মাত্র ৩২ ডলার। একই সময়ে এই খাতে পাকিস্তানে ব্যয় হয় ৩৮, নেপালে ৪৫, ভারতে ৫৯, ভুটানে ৯১, শ্রীলঙ্কায় ১৫১ ডলার। বিগত এক যুগের বাজেট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, স্বাস্থ্য খাত বরাবরই অবহেলার শিকার। এ দীর্ঘ সময়ে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ মোট জাতীয় বাজেটের ৪ দশমিক ২ থেকে ৬ দশমিক ৮ (গড়ে ৫ দশমিক ৫) শতাংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে।

২০১৫ সালের স্বাস্থ্য খাতের খরচে জিডিপি'র অংশ বাংলাদেশে ২ দশমিক ৩৭, ভুটানে ৩ দশমিক ৪৫, ভারতে ৩ দশমিক ৬৬, নেপালে ৬ দশমিক ২৯ ও মালদ্বীপে ১০ দশমিক ৮ শতাংশ। এ সময়ে বৈশ্বিক গড় ছিল ৯ দশমিক ৮৮ শতাংশ (সূত্র: বিশ্বব্যাংক ডেটা ২০১৯)। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ অনুযায়ী আমাদের জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে মোট বরাদ্দ ১৫ শতাংশ এবং জিডিপির কমপক্ষে ৫ শতাংশ হওয়া উচিত। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যেও স্বাস্থ্য খাতে সবচেয়ে কম ব্যয় করে বাংলাদেশ। অর্থাৎ সরকার স্বাস্থ্য খাতকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেয়ার কথা প্রচার করলেও স্বাস্থ্য খাতকে সঠিক গুরুত্ব দিয়ে বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে না। একে তো স্বল্প বরাদ্দ, তার ওপর রয়েছে সীমাহীন দুর্নীতি, অর্থ ব্যয়ে চরম অব্যবস্থাপনা। এতে পরিস্থিতি আরও ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,
দেশব্যাপী সার্বিক দুর্নীতির সাথে স্বাস্থ্য খাতের অপশাসন, দুঃশাসন, স্বচ্ছতার অভাব এবং পর্বতপ্রমাণ দুর্নীতির কথা এখন লোকের মুখে মুখে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তাসহ অনেকেরই দুর্নীতির টাকায় নিউ ইয়র্কে ১৫০টির অধিক ফ্ল্যাটের মালিকানার খবর প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকান্তরে। সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয়েছে করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সুরক্ষাসামগ্রী কেনা ও সরবরাহ নিয়ে। নিম্নমানের সুরক্ষা পোশাক (পিপিই) ও মাস্ক কিনে তা সরবরাহ করা হয়েছে। সরবরাহকৃত নকল এই মাস্কের কারণে কোভিড-১৯ সম্মুখযোদ্ধাদের জীবন মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়েছে। উল্লেখ্য দেড় শতাধিক চিকিৎসক ইতোমধ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। এর দায় কি সরকার এড়াতে পারবে? এদিকে এদের জন্য ঘোষণাকৃত প্রণোদনার অর্থের সিংহভাগই অবিতরণকৃত রয়েছে এখনও। মিডিয়া নিয়ন্ত্রণের এই বৈরী সময়েও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশের দুর্নীতির খবর। দ্য নিউইয়র্ক টাইমস-এ প্রকাশিত সংবাদের শিরোনাম হয়েছে 'বিগ বিজনেস ইন বাংলাদেশ: সেলিং ফেক করোনাভাইরাস সার্টিফিকেট'।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,
জাতিসংঘের মতে, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে 'সর্বজনীন স্বাস্থ্য' নিশ্চিত করতে হলে প্রয়োজন স্বাস্থ্য খাতকে শক্তিশালী করা, বাজেটে যথাযথ বরাদ্দ দেওয়া এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। স্বাস্থ্যের সরকারি বরাদ্দকে খরচ হিসেবে মনে না করে বিনিয়োগ হিসেবে ভাবতে হবে; এর মাধ্যমেই দারিদ্র্য কমে, চাকরি ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, বাড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। তৈরি হয় সুস্থ, সবল ও নীতিনিষ্ঠ সমাজ।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,
স্বাস্থ্য খাত নিয়ে সরকারের চরম উদাসীনতা ফুটে ওঠে করোনার টিকা নিয়ে তাদের চরম বালখিল্যতায়। যে দেশের সাথে টিকার ব্যাপারে বর্তমান সরকার চুক্তি করেছিল সেই দেশই টিকা ও অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যু-উপত্যকায় পরিণত হয়েছে। অথচ সরকার তাদেরকে অগ্রিম টাকা দিয়ে বসে আছে। সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ ও শেয়ারবাজার লুটপাটে অভিযুক্ত এক ব্যবসায়ীর কোম্পানিকে একচেটিয়া ব্যবসার সুবিধা দিতে গিয়ে সরকার পুরো জাতিকে ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। দেশে সব টিকা না এলেও কোম্পানিটি কিন্তু এরই মধ্যে ৩৮ কোটি টাকা মুনাফা করে বসে আছে। আমরা বিএনপি'র পক্ষ থেকে শুরু থেকেই জোর দিয়ে বলেছিলাম টিকার জন্য একক উৎসের ওপর নির্ভর না করে বিকল্প সূত্র খুঁজতে। তখন সরকার বলেছিল, বিএনপি নাকি টিকা নিয়ে রাজনীতি করছে। অথচ সরকার এখন চীন এবং রাশিয়া থেকে টিকা আনার চেষ্টা করছে। অবশেষে প্রমাণিত হলো, টিকা নিয়ে বিকল্প অন্বেষণে আমাদের পরামর্শটিই সঠিক ছিল। যা হোক সরকার টিকা নিয়ে রাশিয়ার সাথে গোপন চুক্তি করেছে বলে জানা যায়। আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন না। এ নিয়ে কারো সাথে কোনো গোপন চুক্তি করা যাবে না। টিকা ক্রয় প্রক্রিয়া হতে হবে স্বচ্ছ। ক্রয়কৃত টিকার ব্যাপারে মানুষকে সব খোলাসা করে জানাতে হবে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,
এ প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, ২০২০ সনের সেপ্টেম্বরে, অর্থাৎ করোনার প্রথম ঢেউয়ের সময়ই বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান করোনা ভ্যাক্সিন প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে ভ্যাক্সিনের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল প্রদানের অনুমতি দিতে, বাংলাদেশকে 'গ্লোবাল এ্যালায়েন্স ফর ভ্যাক্সিন এ্যান্ড ইমিউনাইজেশন'-এর সদস্য হতে, WHO ও ভ্যাক্সিন গবেষণা ও উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করতে, এবং সর্বোপরি সকল বিকল্প সম্পর্কে সজাগ থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন যাতে যথাসময়ে করোনার ভ্যাক্সিন পেতে বাংলাদেশকে সমস্যায় পড়তে না হয়। তখন সে পরামর্শ শুনলে আজ টিকা নিয়ে এ লেজেগোবরে অবস্থা হতো না।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,
টিকা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে দ্রুত সময়ের মধ্যে আমাদের নিজেদের দেশেই ভ্যাক্সিন উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে, সেটা যে দেশের সাথেই হোক। টিকার চাহিদা শিগগিরই চলে যাচ্ছে না। টিকার চাহিদা থাকবে দীর্ঘকাল ধরে। সুতরাং প্রতিবছরই এই টিকার জন্য অপরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকা যাবে না। এ ক্ষেত্রে আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হবে। পাশাপাশি অবশ্যই বিভিন্ন সূত্র থেকে টিকা আমদানির ব্যবস্থা করতে হবে। যে কথা এর আগে আমরা বার বার বলে আসছি।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,
করোনার কারণে দেশের ছোটো-বড় ব্যবসা বাণিজ্য স্থবির। বেসরকারি খাতে নতুন বিনিয়োগের সম্ভাবনা খুবই কম। ব্যাক্তিখাতের প্রায় সকল প্রতিষ্ঠান ব্যয় সংকোচন নীতি অবলম্বন করছে। নতুন কর্মক্ষম লোক বেকারে পরিণত হচ্ছেন। লকডাউনের নামে শাটডাউনে যারা কাজ হারিয়েছেন, তাদের বেশিরভাগই পুনরায় কাজে যোগ দিতে পারেননি। তদুপরি করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় গত এপ্রিলের ৫ তারিখ থেকে সরকার আরোপিত চলমান অপরিকল্পিত, অকার্যকর ও ব্যর্থ লকডাউন এ ধরনের বেকারত্বকে আরেক দফা ত্বরান্বিত করেছে। পাওয়ার এ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ (পিপিআরসি) এবং ব্র্যাক ইন্সটিটিউট অব গভার্ন্যান্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এর এক যৌথ গবেষণা অনুযায়ী দেশে নতুন দরিদ্রের সংখ্যা ২ কোটি ৪৫ লক্ষ। আগের সাড়ে ৩ কোটি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এই নতুন দরিদ্র মিলে এখন দেশে সর্বমোট দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৬ কোটির মতো। দারিদ্র্যের হার ২১% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৪২%- এ দাঁড়িয়েছে। (সানেম জরিপ, জানুয়ারি ২০২১)।

উপস্থিত সাংবাদিকবৃন্দ,
কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ের সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ছে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর। এদের মধ্যে নারী, শিশু, তরুণ ও সুবিধাবঞ্চিতদের ওপর প্রভাবের মাত্রা অনেক বেশি। এ শ্রেণির মানুষের জীবন-মান বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ছে। অনেকেই কর্ম হারিয়ে বেকার হয়েছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে পূর্ব থেকে চলে আসা আয় বৈষম্য। বাংলাদেশের গিনি সহগ (Gini coefficient) এখন ০.৫ এর কাছাকাছি যা বড় ধরনের সম্পদ-বৈষম্যের ইঙ্গিতবাহী। দেশের ছোট একটা গোষ্ঠীর কাছে অধিকাংশ সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। বৃহদাংশ গরিব রয়ে গেছে। গরিব আরো গরিব হয়েছে। পাশাপাশি কর্মসংস্থান কমেছে। তাই তো এদেশের উন্নয়নকে বলা হয় কর্মসংস্থানহীন উন্নয়ন। নূতন গরিব বেড়েছে আড়াই কোটির কাছাকাছি। আগের গরিব, নূতন গরিব আর ক্ষণস্থায়ী (temporary) গরিব মিলে এ সংখ্যা আরো অনেক বেশি। Informal sector এ নিয়োজিত শ্রমিক মোট শ্রমিকের ৮৬% । এদের সংখ্যাও বিপুল। তাই এখন প্রয়োজন সমন্বিত, অংশগ্রহণমূলক ও অন্তর্ভূক্তিমূলক (Inclusive) উন্নয়ন, যেন উন্নয়নের সুফল সবাই ভোগ করতে পারে। মনে রাখতে হবে দেশের মানুষ, কৃষক, শ্রমিক ও ছোট-বড় ব্যবসায়ীদের উদ্যোগের ফসল আজকের এ উন্নয়ন। সরকার কেবল সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তাই সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণই উন্নয়নর মূল চালিকাশক্তি- এ মূল উন্নয়ন দর্শনটি মাথায় রেখে উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করতে হবে। উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সমতাভিত্তিক উন্নয়ন করতে না পারলে এ উন্নয়নের কোনো অর্থ হয় না। আয় ও সম্পদ বৈষম্যের কারণে উন্নয়নের সুফল হতে সাধারণ জনগণ বঞ্চিত হয়। তাই উন্নয়নের সুবিধা সমাজের সবার কাছে পৌঁছে দিতেই হবে, এবং সেক্ষেত্রে সমন্বিত ও অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নের বিকল্প নেই।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,
বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশের সব মানুষের জন্য অর্থনৈতিক অর্জনের সুফল ন্যায্যতার ভিত্তিতে বন্টন করা যায়নি। ফলে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বেড়েই চলেছে। অথচ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম চেতনা ছিল অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে সবার জন্য এমন একটি

সমাজব্যবস্থা নিশ্চিত করা যেখানে সবাই তার প্রাপ্য অধিকার ভোগ করতে পারবে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, বিত্তবান এবং বিত্তহীনের ব্যবধান বৃদ্ধি পাচ্ছে আশঙ্কাজনকভাবে। আপনারা জানেন, গিনি কো-এফিশিয়েন্ট বা গিনিসহগ দিয়ে এটা পরিমাপ করা হয়। বিত্তবান-বিত্তহীনের ব্যবধান দশমিক ৪ পর্যন্ত সহনীয় বলে মনে করা হয়। আমাদের দেশে এটা বর্তমানে দশমিক ৫-এর কাছাকাছি রয়েছে। এটা অসহনীয় একটি অবস্থা। সমাজে যখন ন্যায়-অন্যায়ের কোনো ব্যবধান থাকে না, দুর্নীতি আর অসৎ পন্থাই অর্থ আয়ের প্রধান হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায় তখন সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়তে থাকে। প্রজাতন্ত্রের একজন কর্মচারী বা চাকরিজীবী যখন ৪০০ কোটি টাকা পেইডআপ ক্যাপিটাল দিয়ে একটি ব্যাংক স্থাপনের অনুমোদন গ্রহণ করেন তখন তার টাকার উৎস জানতে চাওয়া হয় না। এই দুর্নীতির কারণে বৈষম্য বাড়ে। একদিকে কিছু মানুষ দ্রুত বিত্তের পাহাড় গড়ে তুলছে, অন্যদিকে ক্রমাগত বঞ্চিতের সংখ্যা বাড়ছে। রাজধানীর অভিজাত হোটেলে গেলে বোঝা যায় কিছু মানুষ কী পরিমাণ টাকার মালিক হয়েছে! এর বিপরীতে সাধারণ মানুষ নিদারুণ অসহায় অবস্থার মধ্যে আছে। ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎ করে এক শ্রেণিরর ঋণগ্রহীতা তা বিদেশে পাচার করছে। আর স্থানীয়ভাবে উদ্যোক্তারা ঋণের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরলেও ঋণ পাচ্ছে না।

ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমাতে হলে সবার আগে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একইসঙ্গে উৎপাদনশীল বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাপকভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। আমাদের জনসংখ্যাকে কার্যকর জনসম্পদে পরিণত করতে হবে। প্রতিটি হাত উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

কোভিডের কারণে বেকার হয়ে পড়া কর্মহীন অসহায় দরিদ্র জনমানুষের হাতে Cash Transfer করতে না পারলে তারা না খেয়ে মারা যাবে। মানুষের হাতে Cash Liquidity'র অভাবে সাধারণ লেনদেন হ্রাস পাবে। এর প্রভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়বে। ভোটারবিহীন জনবিচ্ছিন্ন এ সরকার জনগণের কাছে কোনো দায়বদ্ধতা বা জবাবদিহিতা না থাকায় তারা বেপরোয়া হয়ে পড়েছে। সরকার জনগণের টাকা জনগণকে দিচ্ছে না, অথচ অযৌক্তিকভাবে ১ কোটি টাকার প্রকল্প ২ কোটি টাকায় বাস্তবায়ন করে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রকল্প সময় বৃদ্ধির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ হরিলুট করে বিদেশে পাচার করে দিচ্ছে। আবার মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জনপ্রতি ২৫০০ টাকা প্রদানের ক্ষেত্রে সংঘটিত দুর্নীতি আর হতদরিদ্রে জন্য বরাদ্দকৃত ত্রাণ সামগ্রী চুরির কাহিনী - এসব দেখে মনে হয় করোনা সরকারদলীয় লোকজনের জন্য বরং যেন আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। অর্থমন্ত্রণালয়ের এক অবস্থানপত্রে ধরা পড়েছে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রদেয় ৫০ লক্ষের তালিকার ১৪ লক্ষ ৩৩ হাজার জনের নামই ভুয়া।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

<u>মেগা প্রজেক্টের মেগা চুরি</u>

মেগা প্রজেক্টের মেগা দুর্নীতির সব কাহিনী আপনারা সবাই জানেন। দেখা গেছে যে সরকার সাধারণ মানুষের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চেয়ে মেগা-প্রকল্প গ্রহণেই বেশি আগ্রহী। নিম্নে সরকারের তথাকথিত কয়েকটি ফাস্ট ট্র্যাক প্রজেক্টের চিত্র তুলে ধরা হলো যাতে দেখা যায় কিভাবে অযৌক্তিকভাবে প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি করে প্রকল্প-ব্যয় বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং হচ্ছে। ফাস্ট ট্র্যাক নাম দিয়ে যে প্রকল্পগুলো গ্রহণ করা হয়েছে তার জবাবদিহিতাও হতে হবে ফাস্ট ট্র্যাক। প্রকল্পসমূহের শুরুতেই গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে প্রকল্পের মাঝামাঝি বা শেষ পর্যায়ে এসে নানা সমস্যা হতো না। কিন্তু সরকারের সুশাসনের চরম ঘাটতির কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণের চেয়ে তাদের বেশি দৃষ্টি থাকে কিভাবে যেনতেন ভাবে শুধু

বড় বড় প্রকল্প গ্রহণ করা যায়। চলমান মেগা প্রজেক্টগুলোর প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে চরম অস্বচ্ছতা, অদক্ষতা ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয়ের মধ্যে দিয়ে মহা দুর্নীতির মহা রেকর্ড তৈরি হচ্ছে। যেমন-

পদ্মা সেতু প্রকল্প: বাস্তবায়ন শুরু: ২০০৭ (একনেক)। মেয়াদঃ ডিসেম্বর ২০১৮। প্রাথমিক ব্যয়: ১০ হাজার ১৬২ কোটি টাকা। ব্যয় বৃদ্ধি: (১) ২০১১ সালে প্রথম প্রকল্প প্রস্তাব সংশোধনের পর ব্যয় দাঁড়ায় ২০ হাজার ৫০৭ কোটি টাকা। (২) ২০১৬ সালে দ্বিতীয় দফা সংশোধনের পর ব্যয় দাঁড়ায় ২৮ হাজার ৭৯৩ কোটি। (৩) ২০১৮ সালে প্রকল্প সংশোধন না করে ব্যয় বাড়িয়ে করা হয় ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি টাকা। সম্ভাব্য সমাপ্তি: জুন ৩০,২০২১? পদ্মা সেতু যদি ২০২২ সালেও চালু হয়, তাহলেও এতে সময় লাগবে ৭ বছর ৬ মাস। বর্তমান অনুমিত খরচ ও ভবিষ্যতে বাড়তি খরচ মিলিয়ে পদ্মা সেতুর নির্মাণ ব্যয় হবে যমুনা সেতুর প্রায় চার গুণ। সর্বশেষ, পদ্মা সেতু প্রকল্পের ব্যয় ও সুবিধার বিশ্লেষণ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা বোধগম্য নয়। পদ্মা সেতু প্রকল্পের অধীনে দুই পাড়ে প্রায় দেড় হাজার হেক্টর জমি কেনা হয়। এতে ব্যয় হয় ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা। এসব জমিতে পদ্মা সেতু প্রকল্পের সড়কসহ বিভিন্ন স্থাপনা (দপ্তর, বাসা, পুনর্বাসন এলাকা ইত্যাদি) নির্মাণ করা হয়েছে। যমুনা সেতুসহ দেশের কোনো সেতু প্রকল্পে চরের জমি কেনা হয়নি। অথচ প্রকল্প শেষ হওয়ার পর এ জমি সেতু বিভাগের কোনো কাজেই লাগবে না (সূত্র: প্রথম আলো, ১২ অক্টোবর ২০২০)। এ প্রসঙ্গে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) মন্তব্য হ'ল, "যে জমি স্থায়ী হবে না, প্রকল্প শেষে দরকার নেই, সেই জমি কেনা অপচয়। আসলে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎই এ জমি কেনার মূল লক্ষ্য ছিল। এখন তদন্ত করে বের করতে হবে জনগণের টাকার ভাগ-বাঁটোয়ারা কিভাবে হয়েছে। দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দিতে হবে"। (সূত্র: প্রথম আলো, ১২ অক্টোবর ২০২০)।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প: বাস্তবায়ন শুরু: জুলাই ২০১৬। মেয়াদ: ২০২৫। প্রাথমিক ব্যয়: ১ লাখ ১৩ হাজার কোটি টাকা। ব্যয় বৃদ্ধিঃ ব্যয় বৃদ্ধি হয়নি। সম্ভাব্য সমাপ্তি: জুন ২০২৫। এই প্রকল্পটির টেকনিক্যাল ফিজিবিলিটি, নিরাপত্তা ঝুঁকি এবং সর্বোপরি এর আর্থিক সংশ্লেষ ও বিদ্যুতের দাম নিয়ে বিশ্লেষকগণের নেতিবাচক মন্তব্য সত্ত্বেও বোধগম্য কারণেই এ প্রকল্পটি চলমান আছে। এবারও এ প্রকল্পে ২০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আগামী অর্থবছরে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বরাদ্দ বিদ্যুৎ খাতের সঙ্গে দেখানো হবে। আগে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বেশি দেখানোর জন্য রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের টাকা শিক্ষা খাতে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। এখন এই প্রকল্পের খরচ বিদ্যুৎ খাতে দেখানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর কারণ নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে না। এ কারণে এখানে বরাদ্দ বাড়ানো যাচ্ছে না। রাজনৈতিক অভিলাষে তাই বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে দেখানোর জন্য রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্রের খরচ বিদ্যুৎ খাতে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প: বাস্তবায়ন শুরু: জুলাই ২০০৯। মেয়াদ: জুন ২০২০। প্রাথমিক ব্যয়ঃ ২.৭৭ বিলিয়ন ইউ.এস ডলার। মূল অবকাঠামো নির্মাণে ব্যয় হবে এক দশমিক ৪৯ বিলিয়ন ডলার। সম্ভাব্য সমাপ্তি: ২০২১। কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার কারণে রামপাল প্রকল্প পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে এবং নিকটবর্তী সুন্দরবনে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ডেকে আনবে এ কারণে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলসহ অনেক রাজনৈতিক দল এবং দেশি ও আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী সংগঠন এই বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের তীব্র বিরোধিতা করছে। তা সত্ত্বেও নতজানু সরকার বোধগম্য কারণেই এ প্রকল্প বাস্তবায়নে গোঁ ধরেছে। **আমরা পুনরায় সুন্দরবন বিধ্বংসী রামপাল প্রকল্প থেকে সরে আসার দাবি জানাচ্ছি।**

পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর: বাস্তবায়ন শুরু: জুলাই ২০১৫। মেয়াদ: জুন ২০২১। কাজের অগ্রগতি: প্রায় ৮০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। প্রাথমিক ব্যয়: ১ হাজার ৭শ কোটি ডলার ব্যয় নির্ধারণ । সম্ভাব্য সমাপ্তি: প্রকল্প বাতিল। পায়রা নিয়ে বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষনে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যায়, গভীর সমুদ্রবন্দরের জন্য প্রায় সত্তর কিলোমিটার দীর্ঘ চ্যানেল ঠিক রাখা চ্যালেঞ্জের বিষয়। তাছাড়া স্টাডিতে দেখা গেছে যে জায়গাটি বন্দরের জন্য

যথাযথ নয়। এসব নানা কারণে বর্তমানে পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দরের চিন্তা বাদ দেয়া হয়েছে। তবে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী বলছেন, পায়রা বন্দরকে ঘিরে একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি ও সমীক্ষার কাজ করছে বুয়েট ও নেদারল্যান্ডসের একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে ২৩-২৪টি উপাদান আছে, যার একটি অংশ ছিল গভীর সমুদ্রবন্দর। মূলত এ সমীক্ষাতেই উঠে আসে, পায়রায় গভীর সমুদ্রবন্দর করার মতো যথাযথ গভীরতা সক্ষমতা নেই। আর্থিক দিক থেকে লাভবান না হওয়া এবং রক্ষণাবেক্ষণে মাত্রাতিরিক্ত খরচের সম্ভাবনা ছাড়াও মাতারবাড়ীতে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের সিদ্ধান্ত হওয়ায় পায়রায় গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের চিন্তা সরকার বাদ দিচ্ছে। অথচ, বন্দরের জন্য বেলজিয়ামের একটা কোম্পানির সাথে ড্রেজিং চুক্তি হয়েছে, তাও রিজার্ভ থেকে ৫শ মিলিয়ন ডলার ধার করে, যা মোটেও যৌক্তিক হয়নি। **তাই পায়রা বন্দর প্রকল্পটিকে তুঘলকি প্রকল্প বললে অত্যুক্তি হবে না।**

মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্র: বাস্তবায়ন শুরু: জুলাই ২০১৪ । মেয়াদ: জুন ২০২৩ । কাজের অগ্রগতি: প্রায় ৫০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে । প্রাথমিক ব্যয়: ৩৬ হাজার কোটি টাকা । সম্ভাব্য সমাপ্তি: নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ হবার সম্ভাবনা নাই। প্রকল্পটি শীঘ্রই একটি White elephant এ পরিণত হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ে এর নির্মাণ কাজ শেষ না হওয়ায় উৎপাদন শুরু করার সময়ে এর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু থাকবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কেন এত বিপুল অর্থে এ প্রকল্প নেয়া হ'ল তা এখন প্রশ্নের সম্মুখীন।

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,
আপনারা ইতোমধ্যেই অবগত আছেন যে, বাংলাদেশে সড়ক নির্মাণ ব্যয় পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি, অথচ মানের দিক থেকে সর্বনিম্ন। বিশ্বব্যাংকের তথ্য মতে, বিগত বছরগুলোতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সড়ক নির্মাণে সবচেয়ে বেশি খরচ হয়েছে বাংলাদেশে। (সূত্র: যমুনা নিউজ, ০২ মার্চ ২০১৮)। সড়ক নির্মাণ ব্যয়ে দেশের মাঝেই ব্যাপক পার্থক্য। এতেই বোঝা যায় নির্মাণ খাতে কি ধরনের রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয় হচ্ছে। বিভিন্ন চার লেন সড়ক নির্মাণের প্রকল্প ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র দেখলে তা আরো পরিষ্কার হবে। রংপুর-হাটিকুমরুল মহাসড়ক প্রতি কিলোমিটারের জন্য ৬৬ লাখ ডলার, ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক ৭০ লাখ ডলার, ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক এক কোটি ১৯ লাখ ডলার, ঢাকা-চট্টগ্রাম ২৫ লাখ ডলার, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ২৫ লাখ ডলার, ইটনা-মিঠামইন-অস্টগ্রাম ৩৪ লাখ ডলার, যশোর ঝিনাইদহ মহাসড়ক (৬ লেন) এক কোটি ডলার। অন্যদিকে চার লেন সড়ক তৈরিতে ভারতে ১১ লাখ থেকে ১৩ লাখ ডলার ও চীনে ১৩ লাখ থেকে ১৬ লাখ ডলার খরচ হয়। এই হিসাব অনুযায়ী ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ককে চার লেনে উন্নীত করার খরচ ভারতের কিছু সড়কের তুলনায় প্রায় ১০ গুণ বেশি। 'এস্টিমেটিং অ্যান্ড বেঞ্চমার্কিং ট্রান্সপোর্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার কস্ট' শীর্ষক অধ্যাপক দিমিত্রিয়স স্যামবুলাস তাঁর এক প্রতিবেদনে জানান, চার লেনের নতুন মহাসড়ক নির্মাণে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে খরচ হয় গড়ে ৩৫ লাখ ডলার বা ২৮ কোটি টাকা। আর দুই লেন থেকে চার লেনে উন্নীত করতে কিলোমিটার প্রতি ব্যয় ২৫ লাখ ডলার বা ২০ কোটি টাকা। অর্থাৎ কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশের চার লেনের সড়কের চেয়ে ইউরোপে চার লেনের সড়ক নির্মাণের খরচ অর্ধেক! (সূত্র: ০২ মার্চ, যমুনা নিউজ)।

বাংলাদেশে পার কিলোমিটার রোড কন্সট্রাকশন ব্যয় এই মুহূর্তে প্রায় ৬০ কোটি টাকার কাছাকাছি যা বিশ্বে সর্বোচ্চ। আর যা ভারতে প্রায় ১২ বা ১৩ কোটি। এশিয়া এবং ওয়ার্ল্ড এভারেজ তার চেয়ে কম। যশোর-ঝিনাইদহ মহাসড়কে প্রতি কিলোমিটারে খরচ দেখানো হয়েছে ৮৬ কোটির বেশি। এই ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন পর্যায়ে সাড়ে ৮ থেকে শুরু করে প্রায় ২৭ শতাংশ পর্যন্ত মোট বাজেটের অর্থ অপচয় হয় দুর্নীতির মাধ্যমে। দেশি-বিদেশী বিশেষজ্ঞ ও প্রকল্প টেকনোক্র্যাটদের মতে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী মহলের অনিয়মের মাধ্যমে কার্যাদেশ বিক্রয় করা মেগা প্রজেক্টে দুর্নীতির প্রভাব দিন দিন বেড়েই চলেছে।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,
ব্যাংকিং খাত

ব্যাংকিং খাত চরম দুর্যোগের মধ্যে আছে। ব্যাংকিং খাতকে রীতিমত লুট করা হয়েছে। করোনাভাইরাসের প্রেক্ষিতে সরকারের বিশেষ নীতিমালার কারণে ঋণ গ্রহীতারা ঋণ পরিশোধ করছে না। কিন্তু তাতে ঋণগ্রহীতা গ্রাহক খেলাপি হচ্ছে না! ঋণ ও সুদ আদায় কমে যাওয়ার ফলে আয় কমে গেছে রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকগুলোসহ প্রায় সব ব্যাংকের। ফলে বাড়ছে লোকসানি শাখা। চলতি বছরে সোনালী ব্যাংক ২৫০ কোটি টাকা খেলাপি ঋণ আদায়ের লক্ষ্য ঠিক করেছিল, তবে জুন পর্যন্ত আদায় হয়েছে মাত্র ৫ কোটি টাকা। জনতা ব্যাংক ১ হাজার কোটি টাকা লক্ষ্যের বিপরীতে আদায় করেছে আড়াই কোটি টাকা। অগ্রণী ব্যাংক ২০০ কোটি টাকা আদায়ের বিপরীতে আদায় করেছে সাড়ে ৬ কোটি টাকা ও রূপালী ব্যাংক ৩৫০ কোটি টাকার বিপরীতে আদায় করেছে দেড় কোটি টাকা। অন্য সব ব্যাংকের চিত্রও প্রায় একই রকম।

ঋণখেলাপিদের কবল থেকে দেশকে ও অর্থনীতিকে মুক্ত করতে হবে। ব্যাংকিং ব্যবস্থার শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে। বর্তমানে ঋণ খেলাপির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে বলা হলেও তাদের আবার বিপুল ঋণ Write-off করে দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ ঋণ খেলাপি ও ব্যাংক মালিকদের অনৈতিক সুযোগ দেয়া হচ্ছে। করোনার কারণে সরকার গৃহীত বিশেষ নীতিমালার কারণে ২০২০ সালে গ্রাহক ঋণের টাকা ফেরত না দিলেও খেলাপি করতে পারেনি ব্যাংকগুলো। অথচ গত বছর অবলোপনের মাধ্যমে ছয় হাজার ৫৯০ কোটি টাকার খেলাপি ঋণ ব্যাংকের ব্যালান্স শিট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এর আগের বছরের তুলনায় যা আড়াই গুণ বেশি। ২০১৯ সালে অবলোপনের পরিমাণ ছিল ২,৫৯৭ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত অবলোপন করা ঋণের স্থিতি ৪৪ হাজার ১৫৩ কোটি টাকা। আর ওই সময় পর্যন্ত ব্যাংকের স্থিতিপত্রে থাকা খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৮৮ হাজার ২৮৩ কোটি টাকা। অবলোপন করা ঋণ যোগ করলে খেলাপি ঋণ দাঁড়ায় এক লাখ ৩২ হাজার ৪৩৬ কোটি টাকা। করোনার কারণে গত বছর কেউ ঋণ ফেরত না দিলেও খেলাপি না করার সিদ্ধান্তের আগে ২০১৯ সালে মাত্র ২ শতাংশ ডাউন পেমেন্টে ৫২ হাজার ৭৬৭ কোটি টাকার ঋণ পুনঃতফসিল করা হয়। এর আগে কোনো গ্রাহকের ৫০০ কোটি টাকার বেশি অঙ্কের ঋণ বিশেষ সুবিধায় পুনর্গঠনের সুযোগ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। দেখা যাচ্ছে ব্যাংকগুলো খেলাপি ঋণ আদায়ে জোরদার হওয়ার চেয়ে বেশি মনোযোগ দিচ্ছে অবলোপনের দিকে, যা কোনো ভালো সমাধান নয়।

উপস্থিত সাংবাদিকবৃন্দ,

বাংলাদেশ ব্যাংক তার ঐতিহাসিক Regulatory ভূমিকা আগের মত পালন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা তাই ভেঙ্গে পড়েছে। ব্যাংক মালিকদের পরিবারের সদস্যদের অনৈতিকভাবে বছরের পর বছর পরিচালক পদে বহাল থাকার স্থায়ী সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র ঋণ-খেলাপিরা তুলনামূলকভাবে কম খেলাপি। কিন্তু বড় ঋণ খেলাপিদের অনেকেই ঋণ নিয়ে পরিশোধ না করে তা বিদেশে পাচার করে দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি গবেষণা সংস্থা 'ওয়েলথ এক্সে' এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বিগত দশকে ধনীর সংখ্যা বেড়েছে- এমন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। বাংলাদেশে অতি ধনীর সংখ্যা বাড়ছে ১৭ শতাংশ হারে। এ হার গবেষণাধীন ৭৫টি দেশের মধ্যে সবার শীর্ষে। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, বাংলাদেশে অতি ধনী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র আয় কমছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১০ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত সময়ে দেশের শীর্ষস্থানীয় ৫ শতাংশ পরিবারের আয় বেড়েছে ৫৭ শতাংশ। একই সময়ে অতি দরিদ্র ৫ শতাংশ পরিবারের আয় হ্রাস পেয়েছে ৫৯ শতাংশ। কিভাবে বাংলাদেশ ধনীর সংখ্যা বৃদ্ধির হারে শীর্ষে ওঠে তা বোঝার জন্য বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার নেই। বাংলাদেশ ব্যাংক সকল ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে ব্যাংকিং সেক্টরে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে। বর্তমানে সম্প্রসারণমূলক আর্থিক নীতি থেকে আপাতত সরে আসার সুযোগ নেই। অবশ্য মূল্যস্ফীতির দিকে সতর্কদৃষ্টি রাখতে হবে, কেননা চালসহ

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতি সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। এবারে মূল্যস্ফীতি টার্গেট করা হচ্ছে ৫.৪% যা বাস্তবসম্মত নয়। মূল্যস্ফীতি বাড়তে দেয়া যাবে না।

শিক্ষা প্রযুক্তি ও গবেষণা

বিগত ১ বছরের উপরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকায় এমনিতেই দুর্বল শিক্ষা ব্যবস্থা আরও মারাত্মকভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষাঙ্গনের বাইরে থাকায় শিক্ষার্থীদের মনোবিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, হতাশা ভর করছে। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে, ২০১৯ সনে প্রাথমিকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার ছিল ১৭.৯% । মাধ্যমিকে ২০১৮ সনে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার ছিল ৩৭.৬২% । উচ্চ মাধ্যমিকে ২০১৮ সনে এ হার ছিল ১৯.৬৩% । কিন্তু গত কোভিডকালে এক বছরের অধিককাল ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রয়েছে। তাই আগের তুলনায় এবার শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার বাড়বে বলে ধারণা করেছেন পরিসংখ্যান ও বিশ্লেষকরা। শিক্ষার্থীদের যারা করোনাকালে কাজে যুক্ত হয়েছে তাদের অনেকেই আর স্কুলে ফিরবে না। আবার অনেকে ভর্তি হলেও ক্লাসে অনুপস্থিতির হার বাড়বে। সম্প্রতি প্রকাশিত এডুকেশন ওয়াচের অন্তবর্তীকালীন প্রতিবেদন ২০২১-এ ঝরে পড়ার ব্যাপারে উদ্বেগজনক মতামত পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রাথমিকের ৩৮ শতাংশ শিক্ষক মনে করেন বিদ্যালয় খুলে দেওয়ার পরও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কমে যেতে পারে। ঝরে পড়ার হার বাড়বে এবং শিক্ষার্থীরা শিশুশ্রমে যুক্ত হতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা বিভিন্ন স্তরে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী ইতোমধ্যে ঝরে পড়েছে। বর্তমানে যা আরও বেড়েছে। অনেকে লেখাপড়া ছেড়ে চাকুরীতে যোগ দিয়েছে। এদের শিক্ষায় ফিরিয়ে আনতে হলে শিক্ষা বৃত্তি দিতে হবে। রাষ্ট্রীয় আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে এসব ঝরে পড়া (drop out) রোধ করতে হবে। গণসাক্ষরতা অভিযানের মতে, 'স্কুল খোলার পর সব শিশুকে ফিরিয়ে আনতে একটি অভিযান পরিচালনা করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের সচেতনতার পাশাপাশি আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। এ ছাড়া সরকারের একটা প্রণোদনা দেওয়া দরকার। সেটা হতে পারে মিড ডে মিল বা দুপুরের গরম খাবার। এ ছাড়া পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য এক্সট্রা ক্লাসেরও ব্যবস্থা করতে হবে। স্কুলগুলোতে সার্বিক তদারকিও বাড়াতে হবে।'

মানবসম্পদ উন্নয়ন ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। ছাত্র ও যুব সম্প্রদায় অদক্ষ থাকলে আমরা কাঙ্ক্ষিত Demographic Dividend থেকে বঞ্চিত হব, যা হতে দেয়া যাবে না।

চলমান উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম নতুন জ্ঞান সৃষ্টি, দক্ষতার বিকাশ ও সক্রিয় নাগরিকত্ব সৃষ্টিতে ব্যর্থ হচ্ছে। করোনা সঙ্কটকালে ইন্টারনেট ব্যবহারের গুরুত্ব আরো বেশি স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু মফস্বলে টেলিভিশন না থাকা, ডিভাইসের অভাব, ইন্টারনেটের উচ্চ দাম ও দুর্বল নেটওয়ার্কের কারণেও অনেক শিক্ষার্থী ক্লাস করতে পারেনি। ফলে দরিদ্র পরিবারের শিশুরা গত বছরের পুরোটাই ছিল পড়ালেখার বাইরে। এতে শিক্ষায় বড় বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে। ভার্চুয়াল যোগাযোগ, ভিডিও কনফারেন্সিং, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইত্যাদির গুরুত্ব বিবেচনা করে আইটি প্রযুক্তি ও গবেষণা খাতে বিশেষ বরাদ্দ দিতে হবে। এই খাত ভবিষ্যতে অন্যতম আয়ের উৎস হিসেবে বিবেচিত হবে। শিক্ষা খাতে বিএনপি'র ভিশন ২০৩০-প্রদর্শিত পথে জিডিপি'র ৫% বরাদ্দ করতে হবে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

কৃষিতে উৎপাদন বহুমুখীকরণ ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা

দেশের ৪০% মানুষ এখনও কৃষির ওপর নির্ভরশীল। যতই খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হয়েছে বলে দাবি করা হোক না কেন বাংলাদেশ এখনও খাদ্য আমদানি নির্ভর রয়ে গেছে। খাদ্য নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে খাদ্য গুদামগুলো সংস্কার করে গুদামব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন করতে হবে। নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষের জন্য আয় ভিত্তিক একটি সুষম গণ-খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি। কৃষি ও খাদ্য খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে যথাক্রমে জিডিপি ও বাজেটের কমপক্ষে ১.৫ ও ৫.৭৯%। বৈচিত্র্যকরণ, সবুজ শিল্পায়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতি উজ্জীবন, সমন্বিত শিল্পায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ইক্যুইটি ম্যাচিং তহবিল গঠন করা যেতে পারে। কৃষি

পণ্যের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণে যথাযথ ভর্তুকির ব্যবস্থা করতে হবে। উল্লেখযোগ্য যে, ইউরোপে কৃষি সেক্টরে সরাসরি ৪০% ভর্তুকি দেওয়া হয়। ক্ষুদ্র, মধ্যম ও নতুন উদ্যোক্তাদের প্রাধান্য দিতে হবে। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, বিএনপি আমলে পোল্ট্রি, ফিশারিজ ও লাইভস্টক সেক্টরকে থ্রাস সেক্টর (Thrush Sector) ঘোষণা করা হয়েছিল এবং ঐ সময় এ সেক্টরের প্রভূত অগ্রগতি অর্জিত হয়। করোনাকালে এই সেক্টরগুলো প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। পোল্ট্রি, ফিশারিজ ও লাইভস্টক সেক্টরকে বিশেষ প্রণোদনার আওতায় এনে এদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে যাতে করে সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নে এদের অবদান অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়। সার্বিক কৃষি উন্নয়ন এবং টেকসই বাণিজ্যিক কৃষির রূপান্তরের লক্ষ্যে একটি কৃষি কমিশন গঠন করতে হবে।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

নাগরিক সুরক্ষা কার্ড

করোনাকালে সামাজিক সুরক্ষার অর্থ বিতরণে সীমাহীন দুর্নীতির বিষয় উন্মোচিত হলে রাষ্ট্র কর্তৃক মানুষের অধিকার নিশ্চিতের প্রয়োজনে সহজে নাগরিক চিহ্নিতকরণ সুবিধার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। এ সমস্যা নিরসনকল্পে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রত্যেক নাগরিককে "নাগরিক সুরক্ষা কার্ড" বিতরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এই কার্ডের মাধ্যমে নাগরিকদের বিভিন্ন সময়ে সহজে রাষ্ট্রের তরফ থেকে সহযোগিতা করা সহজতর হবে। তবে এ তালিকা প্রণয়নে রাজনৈতিক দলবাজি পরিহার করতে হবে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

মৌলিক আয়ের বৈশ্বিক মডেল

এবারের বাজেটে গ্রামীণ অর্থনীতি, কৃষি, গ্রামীণ অকৃষি খাতের প্রবৃদ্ধিতে জোর দিতে হবে। বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের জন্য রপ্তানি খাতকে ফোকাসে রাখতে হবে। ফোকাসের জায়গা হতে হবে প্রবাসী আয়। এই তিনটি বিষয়ের বাইরে আপাতত প্রবৃদ্ধির দিকে নজর দেয়ার কিছু নেই। বরং যুদ্ধের সময়ের মতোই আগামী তিন-চার মাসে আমাদের জনস্বাস্থ্যের অবকাঠামো, জনস্বাস্থ্যের কর্মী, প্রশিক্ষণ, গবেষণা, সক্ষমতা এসব বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে। দুঃখ হ'ল গত বছরও এই কথাগুলো বলেছিলাম, কিন্তু কাজ হয়নি। বরং দেখছি স্বাস্থ্য খাতে যেটুকু বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে এর এক-পঞ্চমাংশও ব্যবহার করতে পারেনি সরকার। খুবই দুঃখের কথা যে কোভিডের সময়ও সরকার স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দ ব্যবহার করতে পারেনি। এমনকি গবেষণার এক টাকাও ব্যবহার করতে পারেনি তারা। অথচ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ই বলা আছে স্বাস্থ্য খাতে জিডিপির ৩ শতাংশ ব্যয় করতে হবে। আর এখন ব্যয় করা হয় .৫% । যে সংকট, তাকে সামনে রেখে জোর দেওয়া উচিত জনস্বাস্থ্যের অবকাঠামো ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য খাতকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং সামাজিক সুরক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করে মৌলিক আয়ের একটি সর্বজনীন বৈশ্বিক মডেলে (ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকাম) নিয়ে যাওয়া, যে বিষয়ে বিশ্বের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদেরা একমত হয়েছেন।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

উন্নয়ন বিকেন্দ্রীকরণ

উন্নত বিশ্ব এখন উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের (Tickle down economics) পথ পরিহার করে বিকেন্দ্রীকৃত Bottom-up and middle out অর্থনৈতিক উন্নয়নে মনোনিবেশ করেছে। করোনার অভিঘাত মোকাবেলায় মানুষের আয়-বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে বাজেটের সিংহভাগ ব্যয়ের প্রস্তাব করছে বড় অর্থনীতির দেশগুলো। আমাদের ক্ষেত্রেও একই পথ অনুসরণ করতে হবে। তৃণমূল অর্থাৎ স্থানীয় জনপদের উন্নয়নে বেশি নজর দিতে হবে। তার সাথে মধ্যম শ্রেণির উন্নয়নের উপরও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। তবেই গিনি সহগ সহনীয় পর্যায়ে আসবে। আয় বৈষম্য কমবে। উন্নয়নের সুষম বন্টন হবে। উন্নয়ন বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করতে হবে অর্থ এবং ক্ষমতা উভয় দিক থেকেই। বিশেষ করে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ইউনিটগুলো। ক্যান্সারসহ অন্যান্য জটিল রোগের চিকিৎসা সুবিধা স্থানীয় পর্যায়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় নিয়ে যেতে হবে। এ খাতে জনবান্ধব

বেসরকারি ও সামাজিক উদ্যেগকে উৎসাহিত করতে হবে। উপকারভোগীদের তালিকা প্রণয়নে এনজিও এবং স্থানীয় ভলান্টারি প্রতিষ্ঠানকে কাজে লাগানো যেতে পারে। আয়-বৈষম্য কমানোর একটি উপায় হতে পারে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের স্থানীয়করণ বা বিকেন্দ্রীকরণ। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে হবে। এলাকাভিত্তিক কাঁচামালের প্রাপ্যতা অনুযায়ী শিল্প স্থাপন করে মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

উপস্থিত সাংবাদিকবৃন্দ,

টেকসই উন্নয়নের (Sustainable Development) লক্ষ্যে পরিবেশ বান্ধব বাজেট

বিএনপি'র ভিশন- ২০৩০ তে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য দেয়া হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মানবজাতির অস্তিত্ব যেভাবে বিপন্ন হতে চলেছে, তার জন্য বাংলাদেশের মত দেশ দায়ী নয়। জলবায়ু পরিবর্তনের দায়ভার শিল্পোন্নত বিশ্বকে নিতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে শিল্পায়িত বিশ্বকেই এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কাঠামো গড়ে তুলতে বিশ্বজনমত গঠন ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করার জন্য টেকসই Mitigation এবং Adaptation কৌশল গ্রহণ করতে হবে, যেমন- কার্বন নিঃসরণ হ্রাস, খাল-বিল-নদী-নালা ও জলাভুমি পুনরুদ্ধার, পরিকল্পিত নগরায়ন ইত্যাদি। উপকূল এলাকাসহ সারাদেশে নিবিড় বনায়ন ও সুন্দরবনসহ অন্যান্য বনের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য রক্ষায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আসছে বাজেটে এ বিষয়ে উপযুক্ত প্রতিফলন থাকতে হবে।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

আমি এতক্ষণ বাজেটের সার্বিক বিষয়াদি নিয়ে সাধারণ আলোচনা করলাম। এখন সংক্ষিপ্তাকারে ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট নিয়ে বিএনপি কি ভাবছে সে বিষয়ে ফোকাস করতে চাই। বর্তমানে বিরাজমান জটিল, সংকটজনক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হ'ল জীবন ও জীবিকার সমন্বয় সাধন করে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। সেই আলোকে বাংলাদেশের আসন্ন ২০২১-২০২২ বাজেট প্রণয়নে জাতীয়বাদী দল- বিএনপি'র বাজেট ভাবনা সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করছি:

প্রথমেই নীতিগতভাবে বাজেট কেমন হওয়া উচিৎ-

২০২০ এবং ২০২১ সালের এপ্রিলে কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি থেকে দিন আনে দিন খায় এ শ্রেণির মেহনতি মানুষ, শিল্প, এসএমই, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা, কৃষি, প্রবাসী ইত্যাদি খাতের উল্লেখ করে যে সুনির্দিষ্ট Cash-Transfer ও প্রণোদনা প্যাকেজ দেয়া হয়েছিল তাকে বাজেট প্রণয়নের ভিত্তি ধরে ২০২১-২২ সনের বাজেট প্রণয়ন করতে হবে।

- এবারের বাজেট হওয়া উচিৎ জীবন বাঁচানোর বাজেট, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি মোকাবেলার বাজেট। জীবন ও জীবিকার সমন্বয়ের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। তবে জীবন সবার আগে।
- এবারের বাজেট হবে করোনা ভাইরাসের নিয়ন্ত্রণ ও অভিঘাত থেকে উত্তরণের বাজেট।
- আগামীতে বাংলাদেশকে একটি কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক শক্তি ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমন্বিত, অংশীদারিত্বমূলক (participatory), অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive) অর্থনীতি এবং "সুশাসন ও রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে জবাবদিহিতা" নিশ্চিতকরণের নীতি বাজেটের লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ।
- প্রবৃদ্ধির দিকে নজর না দিয়ে সমতাভিত্তিক উন্নয়ন ও করোনার অভিঘাত মোকাবেলায় মানুষের আয়-বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে বাজেটের সিংহভাগ অর্থ ব্যয় করতে হবে।

- উন্নয়ন বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করে স্থানীয় জনপদ তথা তৃণমূল ও মধ্যম শ্রেণির (Bottom and Middle class) উন্নয়নে মনোনিবেশ করতে হবে।
- উন্নয়নের মূলমন্ত্র হবে জনগণের দ্বারা উন্নয়ন এবং জনগণের জন্য উন্নয়ন।
- বাজেট করতে হবে ২-৩ বছরের জন্য মধ্য-মেয়াদি বাজেট কাঠামোর মধ্যে।
- বাজেটের লক্ষ্য হবে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন।

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

বাজেটে অর্থ বরাদ্দে অগ্রাধিকার ও অর্থ সংকুলান সংক্রান্ত প্রস্তাব-

১. স্বাস্থ্য খাতকে বাজেটের সর্বাধিক তালিকায় রাখতে হবে। চলমান বৈশ্বিক মহামারী প্রতিরোধ ও করোনা চিকিৎসা দুটিই সমানতালে চালিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। স্বাস্থ্য খাতে জিডিপি'র ৫% ব্যয় করতে হবে।

২. নগণ্য বাজেট, চিকিৎসা উপকরণ স্বল্পতা, অবকাঠামোগত দুর্বলতা, নিম্নমানের স্বাস্থ্যসেবা ও অপরিকল্পিত খরচসহ বিবিধ কারণে স্বাস্থ্যখাত হুমকির সম্মুখীন। স্বাস্থ্য খাতের চ্যালেঞ্জগুলো সার্বিকভাবে নির্ধারণ করে কৌশলের সাথে স্বাস্থ্য বাজেট বিন্যাস করতে হবে। করোনা সংকট থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী বাজেট থেকে স্বাস্থ্য খাতের সুস্পষ্ট সংস্কার রূপরেখা দিতে হবে। জাতীয় পরিচয়পত্রের আলোকে প্রতিটি মানুষকে জাতীয় স্বাস্থ্য-কার্ড প্রদানের মাধ্যমে সার্বজনীন জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্য ভাতার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। প্রত্যেকের জন্য পারিবারিক ডাক্তার, নার্স ও অবকাঠামোসহ সামগ্রিক ব্যয় নির্বাহে জিডিপির ৫ শতাংশ বরাদ্দ করতে হবে। বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ঘোষিত বিএনপি'র ভিশন-২০৩০ তে 'সকলের জন্য স্বাস্থ্য' এবং Universal Health Care এর নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে জিডিপি'র ৫% ব্যয় এবং প্রত্যেকের জন্য নথিভুক্ত ডাক্তার (GP) রাখার অঙ্গীকার করা হয়েছে।

৩. প্রত্যেক জেলায় ডেডিকেটেড সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। করোনাকালে জেলা হাসপাতালগুলোতে করোনা বেড ও আইসিইউ সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং তা উপজেলা হাসপাতাল পর্যায়ে সম্প্রসারণ করতে হবে।

৪. করোনাভাইরাসের মন্দার সময় বিশ্বের অনেক দেশ তাদের জিডিপি'র ৫০ শতাংশ পর্যন্ত প্রণোদনা ঘোষণা করেছে। মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের স্বাস্থ্যগত, আর্থিক বা খাদ্যসহায়তা দিয়ে নানামুখী পদক্ষেপ নিয়ে জনগণের পাশে দাড়িয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকার। আইএমএফের তথ্য অনুযায়ী, মহামারী মোকাবেলায় বাংলাদেশ এ পর্যন্ত ব্যয় করেছে জিডিপ'র মাত্র ১ দশমিক ৪ শতাংশ। যার পরিমাণ ৪৬০ কোটি ডলার। এরমধ্যে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় মাত্র ৪০ কোটি ডলার। অন্যদিকে, প্রতিবেশী ভারতের ব্যয় জিডিপি'র ৩ দশমিক ৩ শতাংশ এবং পাকিস্তান এখন পর্যন্ত ব্যয় করেছে জিডিপি'র ২ শতাংশ। লকডাউনের ফলে সারাদেশে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে গরিব মানুষের জীবিকা বিপর্যস্ত হচ্ছে। বেসরকারি খাত- সংগঠিত খাতেই থাকুন বা অসংগঠিত খাতেই থাকুন, যারা চাকরিচ্যুত হচ্ছেন, তাঁদের জন্য অনতিবিলম্বে সামাজিক কল্যাণের (সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার) ব্যবস্থা করতে হবে। এটা প্রায় সব দেশই করেছে। ইংল্যান্ডে লকডাউনের কারণে যারা বেতন পায়নি, তাদের জন্য সরকার আইন করে সহায়তা দিয়েছে। এতে তাদের জিডিপি'র ৩ শতাংশের সমান অর্থ ব্যয় হয়েছে। বাংলাদেশেও এ খাতে ৩ শতাংশ জিডিপি ব্যয় হবে। এর সঙ্গে রয়েছে নতুন ২ কোটি ৪৫ লক্ষ দরিদ্র, আগে থেকেই বেশ কিছু কর্মহীন মানুষ আছেন, সামাজিক কর্মসূচীর মধ্যে আছে এমন অনেকে আছেন, তাঁদের জন্য জিডিপির আরও ৩ শতাংশ ব্যয় হবে। **এ খাতে জিডিপির ৬ থেকে ৭ শতাংশ বরাদ্দ করতে হবে এবং এই অর্থ আগামী চার থেকে পাঁচ মাসের মধ্যেই ব্যয় করতে হবে,** তাহলে যাঁরা কর্মচ্যুত বা কর্মহীন হয়েছেন বা কর্মহীন হবেন, তাঁদের মৌলিক চাহিদা মোটামুটিভাবে পূরণ হবে। তবে সামাজিক সুরক্ষার বরাদ্দ বাড়ালেই হবে না।

নতুন দরিদ্র, পুরোনো দরিদ্র ও ক্ষণস্থায়ী দরিদ্রদের চিহ্নিত করে তাঁদের কাছে সামাজিক সুরক্ষার অর্থ পৌঁছে দেয়া নিশ্চিত করতে হবে।

৫. লকডাউনের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দিন আনে দিন খায়- শ্রেণির গরিব দিনমজুর, পেশাজীবী ও নিম্ন আয়ের মানুষদের প্রত্যেককে এ পর্যায়ে অনতিবিলম্বে রাষ্ট্রীয় বিশেষ তহবিল থেকে বিশেষ বরাদ্দের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে ৩ মাসের জন্য ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা এককালীন নগদ অর্থ পৌঁছে দেয়া নিশ্চিত করতে হবে। ভবিষ্যতে পরিস্থিতির আলোকে প্রয়োজনে এ বরাদ্দ নবায়ন করতে হবে।

৬. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দেশে মোট শ্রমশক্তি ছয় কোটি আট লাখ। এর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক খাতে (শ্রম আইনের সুবিধা পান) কর্মরত জনশক্তি মাত্র ১৪ দশমিক ৯ শতাংশ। সবচেয়ে বড় অংশ ৮৫ দশমিক এক শতাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। এই হিসেবে দেশের পাঁচ কোটি মানুষ দিনমজুরের মতো কাজ করেন। যাঁদের শ্রম আইন-২০০৬ প্রদত্ত নিয়োগপত্র, কর্মঘন্টা, ঝুঁকিভাতা, চিকিৎসাভাতা, বাড়িভাড়াসহ বেশিরভাগ অধিকারই নিশ্চিত নয়। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত এ সকল শ্রমিকদের প্রত্যেককে রাষ্ট্রীয় বিশেষ তহবিল থেকে বিশেষ বরাদ্দের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে ৩ মাসের জন্য ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা এককালীন নগদ অর্থ প্রদান করতে হবে। এদের ক্ষেত্রেও ভবিষ্যতে পরিস্থিতির আলোকে প্রয়োজনে এ বরাদ্দ নবায়ন করতে হবে।

৭. নতুন করে দরিদ্র হয়ে পড়া মানুষের সংখ্যা অর্থাৎ দারিদ্র্যের বর্তমান হার বিবেচনায় নিয়ে সমগ্র দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা সহায়তা প্যাকেজের আওতায় আনতে হবে।

৮. গত বছরের অভিজ্ঞতা এবং দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে নিরপেক্ষভাবে দুঃস্থ উপকারভোগীদের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। যাতে রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে প্রকৃত দুঃস্থ এই মানবিক প্রণোদনা থেকে বঞ্চিত না হয়।

৯. ক্ষতিগ্রস্ত এসএমই, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প ও কৃষিখাতে রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে বিশেষ প্রণোদনা অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে এবং রাজনৈতিক মতাদর্শ বিবেচনায় না নিয়ে প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পোদ্যোক্তাকে এ ঋণ প্রণোদনা দেয়া নিশ্চিত করতে হবে। কোনোরকমেই এ ঋণ ব্যাংকের Depositor's money নির্ভর ঋণ হবে না।

১০. কোভিডকালে কয়েক লক্ষ প্রবাসী দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত প্রবাসীদের রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ঋণ প্রণোদনা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

১১. সকল ধরনের নতুন উদ্যোক্তাদের ৫ বছর কর-ছাড় দিতে হবে।

১২. মন্দাকালীন বিনিয়োগ, ভোগ-ব্যয় ও রপ্তানি কমে যাওয়ায় সামষ্টিক চাহিদা বাড়াতে সরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধিতে সর্বাধিক জোর দিতে হবে।

১৩. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সার্বজনীন মৌলিক প্রয়োজনীয় যেমন- স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা, শ্রমকল্যাণ, কৃষি, শিক্ষা, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

১৪. কৃষি, শিল্প ও সেবাখাতের বহুমুখীকরণ, উৎপাদন ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা, উৎপাদনশীলতা ও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মতো কৌশলগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কৃষি খাতে জিডিপি'র ৫% অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

১৫. কর্মসংস্থান সুরক্ষায় অর্থপূর্ণ সরকারি পদক্ষেপ অত্যাবশ্যক। ছাঁটাই না করার শর্তে প্রণোদনা, অনুদান, কর্পোরেট কর ছাড় ইত্যাদি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। সিঙ্গাপুরে ৭০ শতাংশ বেতন কর্মীর ব্যাংক হিসাবে সরকার দিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতও ইতিবাচক পদক্ষেপ নিচ্ছে কর্মী ছাঁটাই না করার শর্তে। আমাদের দেশেও শ্রমিক স্বার্থে এমন ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক যা শ্রমিকদের একাউন্টে পরিশোধ করতে হবে। তদুপরি সরকারি উদ্যোগে নানামুখী কর্মসৃজন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

১৬. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, লাভজনক বাণিজ্যিক কৃষি, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং কৃষি ও গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ আয়-রোজগার বাড়াতে হবে। সহজ শর্তে ব্যাপকভাবে কৃষি,

পোল্ট্রি, ফিসারিজ ও লাইভস্টক ঋণ প্রদান করতে হবে। কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণে প্রয়োজনীয় ভর্তুকি নিশ্চিত করতে হবে। একটি কৃষি কমিশন গঠন করতে হবে।

১৭. তৈরি পোশাকসহ রপ্তানি খাতে সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে। রপ্তানি বহুমুখীকরণ করতে হবে। বিকল্প বাজার খুঁজতে হবে।

১৮. বাজারে নগদ অর্থ-প্রবাহ নিশ্চিত করতে সক্রিয় মুদ্রানীতি গ্রহণ করতে হবে। মুদ্রানীতিকে স্থিতিশীলকরণ ও উন্নয়নমুখী- দুটো দায়িত্ব পালন করতে হবে। এজন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঐতিহ্যগত অভিভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। প্রয়োজনে প্রথাগত (Conventional) পদ্ধতির বাইরে গিয়ে হলেও অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে নানামুখী সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৯. লক্ষ্য ও খাতভিত্তিক সুনির্দিষ্ট পুনরুদ্ধার কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। জোর দিতে হবে দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূরীকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর।

২০. সঙ্কটকালে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ (Supply chain) নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব বাজারের উপর ছেড়ে দিলে হবে না। কর্মহীন, কর্মক্ষম বেকার, কর্মে নিয়োজিত দরিদ্র জনগণের প্রাতিষ্ঠানিক জীবন চক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা দূর করতে হলে তাদেরকে নগদ অর্থ সহায়তা সাপোর্ট দিয়ে সক্ষমতা তৈরি করতে হবে। কেননা এখন চলছে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ, যা খুবই ভয়াবহ। পুনরায় করোনার মতো আরেকটি ধাক্কা এলে মানুষ আরো দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে নিপতিত হবে। আর বিশ্বে ইতিমধ্যেই করোনার পুনরায় ধাক্কা দেয়ার উদাহরণ তো রয়েছে।

২১. সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রবর্তন, সর্বজনীন জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা গঠন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে শিক্ষা খাতে ব্যাপক বিনিয়োগের পাশাপাশি কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে কর্মসংস্থান ধরে রাখা এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী ক্ষেত্রগুলো বিশাল প্রণোদনার দাবিদার।

২২. রাষ্ট্রের অর্থ জনগণেরই অর্থ। জনগণের অর্থ যাতে মুষ্টিমেয়র হাতে না যায়। প্রণোদনা কেবল প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদেরকেই দেয়া নিশ্চিত করতে হবে। মনে রাখা দরকার, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান জরুরি; কিন্তু কর্মসংস্থানই মূল নিয়ামক।

২৩. শীর্ষ অর্থনীতিবিদদের নিয়ে উচ্চপর্যায়ে একটি অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করতে হবে। নীতিনির্ধারণী বিষয় আলোচনার এই প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়াটা বর্তমানে অনুপস্থিত। বর্তমানে বিচ্ছিন্নভাবে কাজভিত্তিক কিছু কমিটি হয়। কিন্তু সার্বিকভাবে অর্থনীতি পরিচালনা করার জন্য টেকনিক্যাল জ্ঞানের যে তর্কবিতর্ক ও আলাপের দরকার হয়, সেই প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়াটি অনুপস্থিত। অথচ এ ধরনের কমিটি ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও নেপালসহ অনেক দেশে আছে। মধ্য আয়ের দেশ হলে নীতি নির্ধারণী বিশ্লেষণী প্রক্রিয়াও মধ্য আয়ের দেশের উপযোগী হতে হবে।

২৪. জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাকে restore করতে হবে; পুনর্গঠিত করতে হবে এবং দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীল করতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদে এমন টেকসই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা institutionalize করতে হবে যাতে সাধারণ স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি করোনা জাতীয় মহামারীর মতো সংকট মোকাবেলায় পর্যাপ্ত সংখ্যক বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়, যারা যুদ্ধকালীন সময়ের মতো সর্বদা প্রস্তুত থাকবে একটি In built system এর আওতায়।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

<u>অর্থ সংকুলানের উপায়</u>

- ✓ বাজেট ঘাটতি ও জিডিপি'র তুলনায় ঋণের অনুপাত সহনীয় কোটায় সীমিত রাখতে হবে। মন্দায় ভোক্তার ব্যয় ও উৎপাদনের দুরবস্থায় মূল্যস্ফীতির সম্ভাবনা কম থাকলেও মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি কঠোর মনিটরিং করতে হবে।

- ✓ অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমাতে হবে। তবে গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখার স্বার্থে নানামুখী গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। বিদ্যুৎ খাতে ক্যাপাসিটি চার্জ ভর্তুকি বাদ দিতে হবে, সরকারের অতিরিক্ত জনবল ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে।
- ✓ সহজে কর আদায়ের খাতগুলো explore করতে হবে। যেমন, এ দেশে কর্মরত অনিবন্ধিত প্রায় আড়াই লাখ বিদেশী নাগরিকের কাছ থেকে ওয়ার্ক পারমিট ও আয়কর বাবদ প্রায় দেড় বিলিয়ন ডলার আয়কর আদায় করা যায়। ট্রান্সফার প্রাইসিং সেল সক্রিয় করে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো থেকে কর বৃদ্ধি করতে হবে। যে সকল দেশি কোম্পানিকে গোষ্ঠীতান্ত্রিক কর-সুবিধা দেওয়া হয়, তা পুনঃনিরীক্ষণ করতে হবে। কর ভিত্তি সম্প্রসারণ করতে হবে।
- ✓ দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় উৎস থেকে বিদেশি অনুদান (Foreign grant) বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে।
- ✓ অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ব্যাংক খাত থেকে আর ঋণ নেওয়া যাবে না। কারণ এতে ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগের লক্ষ্যে ঋণ প্রাপ্যতা হ্রাস পাবে। ট্রেজারি বিল ও সঞ্চয়পত্রে ঋণ পরিশোধ ব্যয় বাড়াবে। বাংলাদেশ ব্যাংককেই সরকারের অর্থের জোগান দিতে হবে। বর্তমান মুদ্রা সম্প্রসারণ নীতি অব্যাহত রাখতে হবে, তবে সতর্ক থাকতে হবে যেন যে বিনিয়োগ হবে তা quality বিনিয়োগ হয় এবং অর্থনীতি ফলদায়ক হয়। মনে রাখতে হবে, সেই পরিমাণ তারল্যই বাজারে প্রবেশ করতে দিতে হবে, যে পরিমাণ অর্থ সংকোচন ক্ষতি পুষিয়ে দেবে বা মূল্যস্ফীতি সহনীয় অবস্থার মধ্যে রাখবে। পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।
- ✓ বাণিজ্যপ্রবাহে বিঘ্নতা এড়াতে বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা দরকার। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা অদলবদল বা কারেন্সি সোয়াপ, বার্টার ব্যবস্থা চালুর পদক্ষেপ এবং পুঁজির বহির্গমন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। শুধু মুদ্রানীতি দিয়ে বা তারল্য জোগানের মাধ্যমে এ মহাসংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না। প্রয়োজন সক্রিয় রাজস্ব নীতির।

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

বাজেট শুধুমাত্র সরকারের অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয়ের বিষয় নয়। বাজেটে কত আয় ও কত ব্যয় করা হলো তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক নীতি। মূলত আর্থিক নীতি নির্ভর করে একটি সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ওপর। সে প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তির বছরে আমরা আগামীর বাংলাদেশকে কোন্ অর্থনীতির নীতির আলোকে দেখতে চাই, সেটা নির্ধারণ করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ আমরা যদি আমাদের সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক নীতি ঘোষণা করতে না পারি তবে দেশের সার্বিক আর্থিক খাত দিশাহীন হয়ে পড়বে। বিএনপি এবারের বাজেটকে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট অর্থবছরের হিসাবের চেয়ে আগামী দিনের অর্থনীতির সুনির্দিষ্ট পদনির্দেশের যাত্রাবিন্দু হিসেবে দেখতে চায়। আর সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি আগামী বাজেটকে ভবিষ্যতের অর্থনীতির নীতি কৌশল হিসেবে "সুশাসন ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ অর্থনীতি" প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার হিসেবে দেখতে চায়। কারণ উন্নয়নকে শুধু অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে চলবে না, সুশাসন, দুর্নীতি, অর্থের অপচয়ের বিষয়গুলোও মূল্যায়ন করতে হবে। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয় বিবেচনায় নেয়া হলেই কেবল সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। আর এতে দুর্নীতি কমবে, সম্পদের ও অর্থেও অপচয় কমবে। উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের পথে অগ্রসর হওয়ার প্রক্রিয়ায় আমরা যদি সমতাভিত্তিক উন্নতি অর্জন করতে চাই এবং সমাজের সবার কাছে উন্নয়নের সুবিধা পৌঁছে দিতে চাই, তাহলে উন্নয়নকে সমন্বিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন করতে হবে। সেটা কেবল তখনই সম্ভব হবে যখন "সুশাসন ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ অর্থনীতি" কৌশলের ভিত্তিতে দেশের আর্থিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। আর এজন্য দরকার জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক একটি নির্বাচিত জনবান্ধব সরকার, যারা একটি বৈষম্যহীন জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র উপহার দিতে সক্ষম।

আমরা বিশ্বাস করি, একটি দেশের অর্থনীতি তখনই সত্যিকার অর্থে জনবান্ধব হয়ে ওঠে যখন সেখানে "সুশাসন ও জবাবদিহিমূলক সরকার" জনগণের অবাধ নিরপেক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়। সুশাসন ও জবাবদিহিতা

নিশ্চিতকরণের মূল মন্ত্রই হচ্ছে মানুষের রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগের সর্বোত্তম পন্থা "গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা" গড়ে তোলা যা বর্তমানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তির বছরে এই বাজেট-ভাবনা উপস্থাপনের প্রাক্কালে আমরা সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই যে আগামী দিনে একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী, সামাজিক নিরাপত্তা ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে সকল প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের মাধ্যমে একটি কার্যকরী নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমাদের তাই "সুশাসন ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ অর্থনীতি" ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতেই হবে।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ - জিন্দাবাদ।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর
মহাসচিব
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি